



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 13 - 30

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বড় চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে লোকশিল্প ও শিল্পী : প্রসঙ্গ নাবিক ও বংশীবাদক কৃষ্ণ

ড. অজয় কুমার দাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

Email ID: ajoy.003@rediffmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Baru Chandidas,
Sri-Krishna-
Kirttana, Radha,
Krishna, Folk-Art,
Boat, Haar,
Umbrella,
Chamar, Dom,
Bagdi, Aesthetics.

Abstract

In poetry 'Sri-Krishna-Kirttana' of Baru Chandidas there are many references of different races of artisans, such as, 'Potter', 'Teli' (Oil presser), the Napit (Barbar), 'Jhalia' (enchanter), 'Badia' (Serpent-player) 'Bauri' (palanquin bearer), 'Bagdi' or Dhibar (Fisherman), 'Hari' (Sweeper), 'Dom' (Drummer, Cremator, Basket maker), 'Majhi' (Boatman) etc. In his poetry has been delineated the life of these socially backward classes - their art and craft, their belief and faith, their culture, food habit, clothes, religion and rituals-in a word their total way of life. The poetry abounds with various types of Folk-Arts. Among those Boat, Umbrella, Necklace and Flute are noteworthy. Besides around the neck of 'Radha', the heroine of the poetry, are adorned many ornaments, such as, the necklace of 'Gajamoti', the necklace of 'Ulapuspa', 'Sutahaar' (chain-like-necklace), 'Satesari' or Saptakanthi haar. Her head is coronated with gold crown, her ears with ear-rings studded with diamond, her arms with 'Kankan' (bangles) 'Bahuri', 'Angad', 'Balaya' 'Keur' 'Churi', her legs with 'Nupura' (anklet) 'Pasali' etc. All those ornaments have enhanced the beauty of 'Radha'. While going to peddle curd and milk in village fair she is ornated with gold bracelet and 'Ghari' (silver wrist watch). Moreover 'Radha' has beautified herself with many garlands of sweet scented flowers, such as, 'Malati', 'Chanpa', 'Kanar', 'Gulal', 'Chholanga', 'Khadir', 'Langa' etc. She is also dressed 'Pattabastra' (in clothe made of jute) the end of 'Sharee' is embroidered with silk. The hero of the poetry 'Krishna' is also ornated in many ways. He has worn diamond studded gold ear-rings in his ears; his arms, decorated with wild flowers, gold bangles and Angad. His legs are ornated with 'Magarkharu' and 'Nupura'. He had worn the necklace of 'Gajamoti' around his neck. In the episode of 'Nouka' boat is the prime Folk-Art. The hero 'Krishna' is a master boatman. In the episode of 'Chhatra' umbrella is a wonderful Folk-Art. In 'Haarkhanda', Haar or necklace and in 'Bangshikhanda' the flute are also the wonderful Folk-Arts. The poet has compared the hair of 'Barai' (another character) to 'Sweth Chamar' (Yak-tail-

fan) The 'Dom' makes baskets with bamboo or cane. The 'Pashyatohar' (goldsmith) makes ornament with gold. These artisans are the creators, followers and saviors. The poet Baru Chandidas has magnified the beauty of his poem by using these Folk-Arts.

Discussion

এক

বড়ু চণ্ডীদাসের কালে বাঙালি সমাজ ছিল শিথিল-বিন্যস্ত। লোকায়ত বাংলা পুরোপুরি শীলিত ছিল না। সদ্যমাত্র সমাজ শৃঙ্খলার জন্ম হচ্ছে। অরণ্য কেটে বসতি স্থাপিত হচ্ছে। জাতি বৃত্তি এবং শিল্পের একীকরণ ছিল। জাতি অনুযায়ী বৃত্তি নির্ধারিত হত। বাংলার শান্ত জনপদে ছোট ছোট মানুষের বেঁচে বর্তে থাকা, তাঁদের জীবন, জাতিগত বিরোধ মিলন সবই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চিত্রিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নানা বৃত্তিজীবী মানুষ ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ থেকে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মানুষ ছাড়াও গোপ, কুমার, তেলি, নাপিত, ঝালিয়া (ঐন্দ্রজালিক), বাদিয়া (সাপুড়ে), বাউড়ি, বাগদি, ধীবর, হাড়ি, ডোম, মাঝি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-সংস্কার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম-রীতি নীতি, খাদ্যতালিকা - এককথায় সমগ্র জীবনচর্যা বিধৃত হয়েছে। আর লোকায়ত মানুষের সংস্কৃতিপুষ্টি শিল্প জীবনকে গভীর করেছে। যে শিল্পের অনেকগুলি আজ লুপ্ত, অনেক ক্রম-অবশেষ প্রায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এক অর্থে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র শ্রেণির কাব্য। 'রাধা বিরহ' ছাড়া বড়ু চণ্ডীদাস সমগ্র কাব্যের বিষয়কে 'খণ্ড' নামে বিবৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি খণ্ডের শিরোনাম লোকশিল্প দিয়েই। 'নৌকা' প্রাচীন বাংলার তো বটেই, মানুষের সভ্যতা তথা সমাজ মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীনতম লোকযান। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের একটি খণ্ডের নাম রেখেছেন নৌকাখণ্ড। ঠিক তেমনি হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড প্রভৃতি। এই খণ্ডগুলি লোকশিল্প চিহ্নিত। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সমগ্র কাব্যের প্রধান বিষয়। কাব্যের প্রতিটি খণ্ড শিরোনাম তাৎপর্যপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। লোকশিল্পই খণ্ডগুলির বিষয় নিয়ন্ত্রক। খণ্ডগুলি জড়োয়া সুতোর মত সমগ্র কাব্যটির মূল বিষয়কে পুষ্টি করেছে। লোকশিল্পকে কাব্যে এমন মাধুর্যমণ্ডিত প্রয়োগ এবং মর্যাদা দান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিই করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার প্রেমার্তি তো বটেই, কাব্যের ভাবাবেগের উপসংহার ঘটেছে লোকশিল্প দিয়ে। রাধার বেদনা বিশ্ববেদনায় লীন। বাঁশি যেন নিছক বাঁশি নয়, সে বাঁশির ক্রন্দন রাধার প্রেমার্তি। রাধার কান্নার কারণ স্বর মোহন বাঁশিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে চেউয়ের পর চেউ তুলে বিশ্ববাসীকে আকুল করে তুলেছে, পাঠকের হৃদয় আলোড়িত হচ্ছে। কবি লিখেছেন-

“কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।

কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।”^১

একাল কিংবা সেকাল নয়, সর্বকালের চিরন্তনী নারীর বিরহ ব্যাকুলতার রূপ বড়ুর কাব্যে ধরা পড়েছে। মহৎ স্রষ্টার মতই চণ্ডীদাস রাধার হৃদয় ব্যাকুলতাকে শাস্বত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'মুখবন্ধ' অংশে লিখেছেন -

“কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশির স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।”^২

নানা লোকশিল্পে ভরপুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। নৌকা, হার, বাঁশি, বাণ অন্যতম প্রধান লোকশিল্প। নানা অলঙ্কার রাধার গলায়, যেমন- গজমোতির হার, উলপুষ্পের হার বা সুত হার, সাতেসরী (সপ্তকণ্ঠী), রাধার মাথায় মুকুট, কর্ণে হীরাদর (হীরক খচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল)। রাধার হাতের অলংকারও অনেক। দুই বাহুতে সোনার কঙ্কণ, হাতের বাহুরী, অঙ্গদ, বলয়, সোনার নির্মিত দুই 'বাহু পক্ষ', 'রতন কঙ্কণ', 'কনক যুথিকা মালা', 'কেয়ূর', 'বলয়া', বাহুতে 'কনক চুড়ী', মল্ল ও নূপুর,

পায়ে পাসলি প্রভৃতি অলঙ্কার রাখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। রাখা গোপকন্যা। হাতে দধি বিক্রি করতে যান। হাতে যাওয়ার সময় তাঁর হাতে থাকে সোনার চুপড়ি ও ‘রূপার ঘড়ী’।

এছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি রাখাকে প্রসাধিত করেছেন নানা ফুলমালায়। মালতী, চাঁপা, ‘কানড়’, ‘গুলাল’, মালা, ‘ছোলঙ্গ’, ‘খদির’, ‘লঙ্গ’ প্রভৃতি নানা ফুলের মালায় রাখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন কবি। ‘পট্ট’ শাড়ি পরিহিতা রাখা। পাটের শাড়িতে নেতের অর্থাৎ রেশমী আঁচল। কৃষ্ণকেও নানাভাবে অলংকৃত করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি। কৃষ্ণ কানে পরেছেন হিরায় জড়ানো রতন কুণ্ডল, হাতে পরেছেন বনমালার আভরণ, রতন কঙ্কণ আর অঙ্গদ যুগল। কৃষ্ণের পায়ে ‘মগরখাড়ু’ এবং নুপুর, আর গলায় গজমোতি। নানা মঙ্গলিক লোকশিল্প যেমন আম্রপল্লবের ঘট কাব্যে উপস্থিত। বাঙালি সধবা নারীরা সেকালে শাঁখা পরতেন।

নিম্নবর্ণের মানুষ সমাজে ব্রাত্য বিবেচিত হয়েছে। পরিশীলিত সমাজ যাত্রাকালে তাঁদের চোখে দেখাকে অশুভ বলে বিবেচনা করেছেন। তেলি যখন তেল বিক্রি করার জন্য হাঁক ডাকে, তখন তা শোনা অশুভ বিবেচিত হয়। অনুরূপে যাত্রাকালে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যোগিনীকে দেখা অশুভ বলে মনে করেছে উচ্চবর্ণের মানুষ।

দুই

লোকযান - নৌকাখণ্ডের নৌকা - কৃতবিদ্য নাবিক কৃষ্ণ

কংসাসুর প্রপীড়িত পৃথিবীর আর্ত-ত্রাণে ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর ‘কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে’ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীরাধাও জন্মগ্রহণ করেছেন ‘পদুমা উদরে’। জন্মখণ্ডে কৃষ্ণ এবং রাধা জন্মগ্রহণ করেছেন। সমগ্র কাব্যের বিষয়বস্তু বিভক্ত হয়েছে তেরোটি খণ্ডে : জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমন খণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাখাবিরহ। জন্মখণ্ডে তিনটি চরিত্র যথাক্রমে - রাখা, কৃষ্ণ এবং বড়াইয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কংসবিনাশের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অবতারের কথা বলা হয়েছে। তাম্বুলখণ্ড থেকে প্রকৃত কাহিনীর শুরু। এখানে কৃষ্ণ রাখাকে তাম্বুল পাঠিয়েছেন বড়াইয়ের মাধ্যমে। রাখা সেই তাম্বুল গ্রহণ করেননি। তিনি কৃষ্ণকে চড় মেরেছেন। দানখণ্ডে রাখাকে লাভ করার জন্য কৃষ্ণ এবং বড়াইয়ের আলোচনা। দানী সেজে কৃষ্ণ রাখার দধি দুগ্ধ নষ্ট করেছেন। কৃষ্ণ রাখাকে বলপূর্বক সম্ভোগ করেছেন। এই খণ্ডেই রাখা ধীরে ধীরে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ভারখণ্ডে রাখার ভাবান্তর বিশেষ লক্ষণীয়। কৃষ্ণ রাখার ভারবহন করছেন। ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণ রাখার ছাতা ধরেছেন। বৃন্দাবন খণ্ডে কৃষ্ণ এবং রাখার মিলন হয়েছে। বাণখণ্ডে রাখা সম্মোহন বাণে বিদ্ধ হয়ে প্রকাশ্যেই কৃষ্ণকে কামনা করেছেন। আর বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করেছেন রাখা। এই নিয়ে দু’জনের মধ্যে কলহ হয়েছে। সর্বোপরি রাখা বিরহ খণ্ডে কৃষ্ণকে হারিয়ে রাখা বিলাপ করেছেন। এখানেই কাব্যটি খণ্ডিত।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জলযান হিসেবে নৌকা যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলযান হিসেবে নৌকার কোন বিকল্প নেই। নৌকা শুধু জলযান হিসেবেই নয়, সমগ্র মধ্যযুগে আশ্চর্য শিল্প সুযমা লাভ করেছিল নৌকা। নৌকাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলায় নানা সংস্কার বিশ্বাস, শুভাশুভ বোধ-রীতি-নীতি গড়ে উঠেছিল। বাঙালি জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি মোটিফ। ঐতিহ্য আশ্রিত জাতি মোটিফ সৃষ্টি করতে পারে। এককথায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের নৌশিল্প বাঙালির উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার ফল।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ খণ্ডের নাম নৌকাখণ্ড। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ নৌকার মাঝি। কৃষ্ণ শুধু মাঝি নন, তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম চিহ্নিত নৌশিল্পী। শ্রীকৃষ্ণ শুভক্ষণে নৌকার কাঠ কেটে দণ্ড পত্তন করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস নৌকা নির্মাণ প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে ভোলেননি -

“কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।

শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে।। ১।।

চারি পাট চির নাত দিল যোখ মাপে।

তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে।। ২।।

ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝমুনাএ।। ৩।।
নাঅ গড়ায়িল কাহাঞিঁ গুণিআঁ হৃদয়ে।
দুস্ট ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ।। ৪।।
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহাঞিঁ যুগতি বিশেষে।
আর এক বড় নাঅ গড়িল হরিষে।। ৫।।
জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ।। ৬।।
রাধার পস্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহাঞিঁ।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীআই।। ৭।।”^৩

অনুবাদ - “শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বিধানে কাঠ কাটিয়া শুভক্ষণে দণ্ড পত্তন করিলেন।। ১।। নৌকার মাপজোখ অনুসারে চারি পাট তক্তা চিরিলেন এবং তুলাদণ্ডের পরিমাণে গুড়া যোগ করিলেন।। ২।। ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবার জন্য নৌকার ফাঁকে ফাঁকে পাটের পলিতা গুঁজিয়া দিলেন। তাহার পর নৌকা লইয়া গিয়া মাঝমুনায়া নামাইলেন।। ৩।। মনে মনে ভাবিয়া কৃষ্ণ এমনভাবে নৌকা গড়িলেন যেন তাহাতে দুইজনের বেশি তিনজন না যাইতে পারে।। ৪।। পরে বিশেষভাবে যুক্তি আঁটিয়া হুঁটচিঙে আর একটি বড় নৌকাও নির্মাণ করিলেন।। ৫।। সেই নৌকাটি জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া ছোট নৌকাটি লইয়া ঘাটের নিকট গেলেন।। ৬।। সেইখানে কৃষ্ণ রাধার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।। ৭।।”^৪

নৌকা সৃষ্টির প্রক্রিয়া এরকম - শুভমুহূর্ত বিবেচনা, কাঠকাটা, নৌকার মাপ, তক্তা চেরা, নৌকার ছিদ্র বন্ধ করা, ছোট নৌকা তৈরি সম্পূর্ণ করা। দু'জনের বেশি তিনজন যাতে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। শেষ পর্যন্ত রাধার জন্য অপেক্ষা করেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ রাধাকে নৌকায় চড়তে বলেছেন। রাধা ভয় পেয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন - “পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গড়ন আক্ষার।”^৫ অর্থাৎ - পাঁচখানি পাট দিয়ে গড়া আমার নৌকা। অন্য একটি পদে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন-

“পাঞ্চ পাটে নাখানী আক্ষার।
আপণেই ধরিলোঁ কাঁটার।।”^৬

অর্থাৎ পাঁচখানি তক্তা দিয়ে আমার নৌকাখানি তৈরি। আমি নিজেই হলাম তার কর্ণধার বা নাবিক। মাঝি হিসেবে কৃষ্ণ যে কতবড় দক্ষ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার তার পরিচয় রেখে গেছেন। নৌকা তৈরির চিন্তন পরিকল্পনাও কৃষ্ণের আয়ত্তাধীন। কৃষ্ণ পারানির কড়ি হিসাবে ‘সাতেসরী হার’ দাবী করেছেন -

“যবে তোক্ষা করিবোঁ মো পার।
বান্দ দেহ সাতেসরী হার।।”^৭

কৃষ্ণের এমন মিলন ব্যাকুলতাই তাঁর চরিত্রের সুনামকে ক্ষুণ্ণ করেছে। নৌকার চালক হিসাবে কেমন ছিলেন কৃষ্ণ? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন -

“তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহু বাহে নাত্র
হে হে লহে লহে।।

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।।”^৮

আনন্দসূচক ধ্বনি হি হি উচ্চারণ করতে করতে কৃষ্ণ নৌকা বাইতে লাগল। নৌকা ছুটেতে লাগল যেন আকাশের তারা, ঠিক উল্কার মত। বড় চণ্ডীদাস সত্যিই কৃষ্ণ কথা লিখেছেন। কৃষ্ণ অনেক কৃতবিদ্য, সক্রিয়। নাবিক কৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বাণীতীর্থে অমরভূমিতে স্থাপন করেছেন। গ্রাম্য গোয়ালিনী রাধা স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত ঠিকই, তবু মনে হয় নৌকাখণ্ডে রাধা পুরোপুরি দেহের শীতলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অনেকটা সলজ্জ, ইচ্ছুক রতি মিলন কামনা তাঁর মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। সমালোচক লায়েক আলি খানের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য -

“সে (রাধা) শরীর সম্বোধনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে দানখণ্ডে। প্রথমে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু এর ফলেই সে রাতারাতি নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই নৌকাখণ্ডে দেখি ছদ্মবেশী নাবিক কৃষ্ণের কাছে একান্ত একক আত্মসমর্পণের আছিল। সৃষ্টি করেছে সে।”^{১৬}

একথা ঠিক, নরনারীর মিলন তাঁদের অভিজ্ঞতা পুষ্ট করে তোলে। রাধার মনস্তাত্ত্বিক পরিপূর্ণতা কৃষ্ণের সাথে মিলনের পরই স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। কৃষ্ণের প্রশংসা করতে বিদগ্ধ সমালোচকেরাও বুঝি সংকুচিত। সমালোচক লিখেছেন -

“শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মস্মাৎ করিয়াছে রাধা। যাহার নামকীর্তন করিতে কাব্যটির রচনা, সেই কৃষ্ণই উহার দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।”^{১৭}

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকে প্রশংসা করার মত যথেষ্ট পরিসর আছে। কৃষ্ণের সক্রিয়তা, প্রত্যাশাপূর্ণমতিত্বকে মান্যতা দিতে হয়। এমন রক্তমাংসের কামনা-বাসনার পুরুষ চরিত্রটি না থাকলে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি সম্ভব ছিল না। রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভূমিকাহীন সামান্য নারী হয়েই থাকতেন। তাঁর প্রেমিকা সত্তা প্রতিধ্বনিত হত না। তাঁর হৃদয়ের অক্ষুট বেদনা ভাষা পেত না।

নৌকাখণ্ডের অন্য পদটিতে নাবিক কৃষ্ণ নৌকা দুলিয়ে দিলেন। কিছু পরে কৃষ্ণ নৌকা ডুবিয়ে দিলেন। নিমজ্জমান রাধা নন, ভাসমান রাধা। তিনি কৃষ্ণের কোলে ভাসছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন-

“আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে।

পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে।।

কোণ পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজ ঘর।”^{১৮}

ভয় পেয়েছেন রাধিকা। তাঁর পসরা জলে ডুবে গেছে। তিনি ঘরে ফিরবেন কোন মুখে। এ কৃত্ত্ব নাবিক কৃষ্ণের। তিনি কাব্যের মধ্যমণি। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে কাব্যের প্রকৃত রস আন্বাদন করা যায় না।

তিন

ছত্রখণ্ডের - ছাতা : লোকশিল্পের আর এক বিস্ময়

ছাতা লোকায়ত শিল্পের এক আশ্চর্য নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ছাতাকে কাব্যের একটি খণ্ডের শিরোনাম করেছেন। খণ্ডের নাম রেখেছেন ‘ছত্রখণ্ড’। লোকশিল্পকে এক লহমায় চিরন্তন করে তুললেন বড়ু চণ্ডীদাস। অধ্যাপক লায়োক আলি খানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

“ছত্র খণ্ডের রাধিকা ভারখণ্ডের মতই কৃষ্ণকে ছাতা ধরিয়েছে নিজের কাছে কাছে রাখার জন্য। লোকসাধারণের সমালোচনাকে নীরব করে দিয়ে সে কৃষ্ণসান্নিধ্য প্রত্যাশা করেছে। এবারে ভারখণ্ড থেকেও বেশী কাছে পেয়েছে সে ছত্রধারী কৃষ্ণকে।”^{১৯}

লোকশিল্প সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম একক। মহৎ স্রষ্টা লোকশিল্পের মধ্য দিয়েই কাব্যকে ব্যঞ্জিত করে তোলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন-

“ছত্র ধর কাহাঞিঁ দিবো সুরতী।

নহে মনে পরিহার আরতী।।”^{২০}

কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া। অবশেষে সুরতির আশ্বাস দিয়েছেন রাধিকা। আর কৃষ্ণকে রাধার মাথায় ছাতা ধরতে বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি পুনরায় ছত্রখণ্ডে লিখেছেন-

“আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে

তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে।।

আপণে বোলহ বড়ায়ি দেব গদাধরে।

ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে।।”^{২১}

রৌদ্র দগ্ধ রাধিকা। প্রাণ ওষ্ঠাগত। তিনি বড়াইকে বলেছেন, গদাধরকে বলতে - যে সে তাঁর মাথায় ছাতা ধরুক। রাধা তাঁকে আলিঙ্গন দান করবেন। বড়াইও কৃষ্ণকে জানিয়েছে-

“ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
 কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে।।”^{২৫}

অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছাতা ধরুক। কিছু দূর গেলেই রাধার সঙ্গে মিলন হবে।
 কৃষ্ণ জানিয়েছে, রাধাকে পাওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা করার ইচ্ছে তার নেই। এত বড় অপমানও তিনি সহ্য করতে পারবেন। রাধা কৌশলী কৃষ্ণের ছলনা বুঝে নিয়েছেন। তাঁকে দুর্মতি ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন-

“আম্মা ছাতী ধরাই আঁ কি সাধিবেঁ মান।
 সহিতে না পরিবোঁ এত বড় আপমান।।
 যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ।
 ছাতী কেহে না ধর আসী মোর পাশ।।”^{২৬}

শুধু কৃষ্ণ কেবল মিলন কাতর নয়। নারী সুলভ সলজ্জতা নিয়ে রাধাও মিলনে সম্মতি দিয়েছেন। ছাতা উপলক্ষ্য হয়েও রাধাকৃষ্ণের মূল প্রেমভাবনায় প্রদীপ জ্বালানোর সলিতার কাজ করেছে। লোকশিল্পকে সাহিত্যে প্রয়োগ করে বড় চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যমহিমাকে বহু দূর বিস্তৃত করেছেন।

চার

হারখণ্ডের হারঃ রাধার রূপ - মানসিক সংকটের ছবি

কেমন ছিল রাধার দেহ সৌন্দর্য? রাধার লাবণ্য কেমন? রাধার লাবণ্য জলের মত। তাঁর চুল শৈবাল সদৃশ। তাঁর চোখ পদ্মের মত। বাহু পদ্মের মৃগাল। আর নাভিদেশ প্রস্ফুটিত পদ্ম। স্তনযুগল চক্রবাকের মত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন -

“লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
 বদন কমল শোভে আলক ভষল।।
 নেত্র উতপল তোর নাসা গাল দণ্ড।
 গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড।।”^{২৭}

হারখণ্ডের ‘হার’ কবিতায় কেবল রাধার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেনি। বরং হার রাধার মানস সংকটকে বহুগুণিত করেছে। রাধার সমাজলগ্নতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ রাধার হার চুরি করেছে। হারখণ্ডে কাহিনীর শুরু এখান থেকে। কবি লিখেছেন-

“যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
 তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।।
 আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
 হরিলেক হার মোর বালগোপালে।।”^{২৮}

রাধাকে বড়াই ঘরে নিয়ে গেছে। হারখণ্ডে বড়াই আইহনকে বুঝিয়েছে, যে এক মত্ত বলদের ভয়ে রাধা কাঁটাবনে পড়ে গিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। আর গাছে লেগে রাধার গজমোতি হারটিও ছিঁড়ে পড়েছে - ‘গাছে লাগি ছিঙিল সকল গজমুতী’।^{২৯} গজমোতি রূপকথার বিষণ্ণ স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সেই সে রাধিকা - কোথায় ছিল তাঁর গ্রাম - কেউ জানে না। তবুও এক অতীত ধূসরতা সহসা হৃদয়কে প্লাবিত করে তোলে। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসুর বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য -

“বড় চণ্ডীদাসের রাধিকা আমাদের দেশের সাধারণ মেয়ে, বহুযুগের সংস্কার ও নিষ্ঠাবোধ তাহার মধ্যে জাগ্রত। তাই প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ অবৈধ প্রেমের প্রতি আসক্তির পরিচয় দিয়া তাহার পক্ষে প্রত্যাবর্তনের বাসনা স্বাভাবিক। কামনা এবং কামনা নিগ্রহের প্রচেষ্টা- যমুনা ও হারখণ্ডের মধ্যে সেই মানস-বিপ্লব আমরা প্রত্যক্ষ করি - প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত পুলকিত হই।”^{২০}

পাঁচ

বংশীখণ্ডের - বাঁশিঃ তির বিদ্ধ পাখির ডানা ঝাপটানো

বড় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি কুশল ব্যক্তিত্ব। সমস্ত বঙ্গসাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করলেও এমন কৃতবিদ্যা লোকশিল্পীর দেখা মেলা ভার। সময়ের চিহ্নহীন ধারাপাতে নৌকা প্রথম কে সৃষ্টি করেছিল আমরা জানি না। কে প্রথম আড়বাঁশি নির্মাণ করেছিল, আমরা তাঁর খোঁজ পাই না। তাঁদের আমরা ভুলে গেছি। তাঁরা নাম চিহ্নহীন হারিয়ে যাওয়া মানুষ। গোপবালক কৃষ্ণ জন্মসূত্রে বা জাতি-বৃত্তি সূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে নৌকা বা আড়বাঁশি নির্মাণের কুশলতা অর্জন করেননি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডে এবং বংশীখণ্ডে যথাক্রমে আমরা কৃষ্ণকে চমৎকার নৌ কারিগর এবং বাঁশি তৈরির কারিগর হিসেবে দেখেছি। কৃষ্ণ আশ্চর্য বংশীবাদক।

বংশীখণ্ডের বাঁশি প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প। পল্লির সেই রাখাল বালকেরা আজ আর নেই, তাদের লোকশিল্পও গেছে হারিয়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ বড় চণ্ডীদাসের এক আশ্চর্য সৃষ্টি, আশ্চর্য কর্মকুশল ব্যক্তিত্ব। বংশীখণ্ডের নায়ক কৃষ্ণ নয়, খণ্ডের নায়িকা রাধা নয়, বংশীখণ্ড বাঁশি সর্বস্ব। বাঁশীখণ্ডে বাঁশি নায়ক, বাঁশি নায়িকা। বাঁশিকে বাজানো হয়। বাঁশি কথা বলে, বাঁশি গান গায়। আর সে বাঁশির সুরে, এক নায়িকার হৃদয় টলমল হয়ে যায়। বংশীখণ্ডে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে আছে বাঁশির কাহিনী। একটি লোকশিল্পকে নিয়ে পাঠক হৃদয়ের ভাব তরঙ্গে ঢেউ তুলেছেন কবি। রাধার হৃদয়রাজ্যকে বৈশাখিক কালবেলায় পৌঁছে দিয়েছে বাঁশি। চরিত্রগুলির চিত্রনাট্য নির্মাণ করেছেন বড় চণ্ডীদাস। সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে এই কথা বলা বাঁশি।

বাঁশি কিভাবে সৃষ্টি করেছেন কৃষ্ণ? কেমন তাঁর প্রযুক্তি? কৃষ্ণের তৈরি এই মোহন বাঁশিতে অনুপম সাতটি ছিদ্র আছে। কৃষ্ণ সেই ছিদ্রে সুবর্ণ বলয় লাগিয়েছেন। হিরার কারুকার্যশোভিত সেই বাঁশি। সেই বাঁশিকে কৃষ্ণ গুঁকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করেছেন। সেই বাঁশির ধ্বনিতে পৃথিবী মুগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন-

“তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের দাসী।
 সৃজি(ল) কাহ্নিঞঁ তবৈঁ মোহন বাঁশি।।
 সাত গুটি বিদ্ধ তাত করি আনুপাম।
 সুবল্লের সান্ধী হিরার বাঙ্কিল কাম।।
 হরিষে পুরিআঁ কাহ্নিঞঁ তাহাত গুঁকার।
 বাঁশির শবদেঁ পারে জগ মোহিবার।।”^{২১}

এই বাঁশি অত্যন্ত যত্নে নির্মাণ করেছেন কৃষ্ণ। গোকুল সমাজে এই বাঁশি মান্যতা পেয়েছে। নানা রত্নখচিত এই বাঁশির শোভা অপরূপ। এই বাঁশির ধ্বনিতে সমস্ত সংসার মোহিত হয়ে যায়। এই বাঁশির দু'পাশে মুক্তার ঝালর আর পাটের গুচ্ছ শোভা পায়। মণি মাণিক্যে খচিত সোনার পাত দিয়ে মোড়া এই বাঁশি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লিখেছেন -

“আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে।
 বাঁশি নির্মিল আঙ্কে গোকুলসমাজে।।
 শোভে রতনজড়িত বাঁশি আঙ্কারে।
 নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে।।

 এঁবে কে না নীল মোহন বাঁশে।

মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে ।।
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা ।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশির বারতা ।।”^{২২}

সে বাঁশির ধ্বনি স্বর্গ দ্বারেও শোনা যায় - ‘আল রাধে জার ধুনী সরগদুআরে’ ।^{২৩} এই বাঁশিকে রাধা বলেছেন ‘মৌহারী বাঁশি’ ।
কবি লিখলেন - ‘আল বাড়ায়ি চাহা চাহা/ কোণ দিগে মোহারী বাজে ।’^{২৪}

কোথাও রাধা এই বাঁশিকে আড়বাঁশি বলেছেন। কৃষ্ণ যে ‘আড়বাঁশি’ বাজান তা শুনলে রাধার মনে হয়, যেন
পিজরার শুক পাখি গান করছে -

“নান্দেদর নান্দন কাহু আড়বাঁশি বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ ।”^{২৫}

এই বাঁশির শব্দে কেমন করেন রাধা? রাধার দেহ আকুল এবং মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাঁশির শব্দে রক্ষন
এলোমেলো হয়ে গেল। কবি লিখেছেন -

“আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশির শব্দেঁ মো আউলাইলোঁ রক্ষন ।।”^{২৬}

বাঁশির শব্দে রাধার চিত্ত স্থির থাকে না। তিনি পাখি হয়ে কৃষ্ণের কাছে উড়ে যেতে চান। তাঁর চোখ থেকে অবিরত
জলধারা বর্ষিত হচ্ছে। রাধার মনে আগুন লেগে গেছে। তাঁর বুকের পাঁজর ভেঙে যায়। ভীষণ একাকীত্বে তিনি ভোগেন।
তাঁর দশদিক শূন্য বোধ হয়। তাঁর প্রাণ যেন বের হয়ে যায়। রান্নার ‘জুত’ হারিয়ে ফেলেন রাধিকা। তিনি অম্বল ব্যঞ্জে
ঝাল মশলা দিলেন। আর শাকের হাঁড়িতে, যে হাঁড়ির কানা টাইটুম্বর হয়ে যায়, সেখানে তিনি নিমঝোলে লেবুর রস নিংড়ে
দেন আর বিনা জলে চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ যখন কিশলয়ের শয্যা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন রাধা
তাঁর বাঁশি চুরি করেন। বাঁশি হারিয়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি ক্রন্দন করেন। বাঁশি না পেলে তিনি রাধার অলঙ্কার
কাড়িয়ে নেবেন, রাধাকে বেঁধে রাখবেন, এমনকি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলবেন বলেন। বাঁশি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণের
কাতর আকৃতি তাঁকে সত্যিকারের শিল্পী মানুষ করে তোলে। আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষণের ধারার মত শ্রীকৃষ্ণের নয়নে অশ্রুধারা
ঝড়ে পড়ে। বংশীবাদক কৃষ্ণের বংশী প্রীতি তাঁকে অনন্য মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলে। তাঁর শরীর দুর্বল হয়, তিনি
ভাল বস্ত্র পরিধান করতে পারেন না। অবশেষে রাধা কৃষ্ণকে বাঁশি ফিরিয়ে দেন। কৃষ্ণের তাপিত হৃদয় শান্ত হয়।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘বংশীখণ্ড’ পড়ে মনে হয়, সমালোচকেরা বুঝি কোন শিল্পীর প্রতি অবিচার করেছেন। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর
ত্রিবেদী যথার্থই বলেছেন -

“বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশির উদ্ধার করিয়া সাহিত্য - পরিষদের জীবন সার্থক হইল।”^{২৭}

বংশীখণ্ডের কৃষ্ণ আশ্চর্য সৃষ্টি। রাধাও। বড়ু চণ্ডীদাস বংশীখণ্ডে বেদনার গীতি আলেখ্য লিখেছেন। মানবিক
গুণসম্পন্ন কৃষ্ণ সমস্ত তত্ত্ব কথার উর্দে। রাধার অশান্ত মর্মদাহের সার্থক বাণীকার বড়ু চণ্ডীদাস। অধ্যাপক লায়েক আলি
খান যথার্থই বলেছেন -

“আজ প্রীতির স্মৃতি হয়ে যমুনা পার থেকে উন্মাদ করা বাঁশির সুর রাধিকার কানে এসে লাগে। প্রাণে
জাগে অসহ্য বিরহবোধ। এই অস্থিরচিত্ততার মূলে আছে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার ভালবাসা। এবং তার
উদ্দীপন কৃষ্ণের হাতের মোহন বাঁশি। রাত্রি এবং দিন যাপিত জীবনের সমস্ত কিছুতে কৃষ্ণের বাঁশির
সুর মিশে রাধিকাকে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে... কিন্তু বংশীখণ্ডে রাধিকার এই আত্মসমর্পণ
বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকারে পর্যবসিত হয়েছে। অসহায় প্রেমিকার উপায়হীন, অভিমানবিহীন
আত্মস্বীকৃতিকে জ্বলন্ত অক্ষরে চিহ্নিত করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস।”^{২৮}

ছয়

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আদি মধ্যযুগের একমাত্র প্রামাণিক সাহিত্যিক নিদর্শন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের অভিমত-এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এধারে কিছুতেই হতে পারে না। সুনীতিকুমার তাঁর সুবিখ্যাত 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে লিখেছেন -

"But there is no Middle Bengali work dating from before 1500 which is Preserved in a Contemporary MS.; except one, and that is the 'Sri-Krsna-Kirttana' The MS; from the style of script it employs, according to expert opinion belongs to the latter half of the 14th Century ... The Sri Krsna-Kirttana belongs to what may be called the Early Middle Bengali Stage."^{২৯} (ক)

গ্রন্থের কাল নির্ণয়ে সুনীতিকুমারের অভিমতটিকে বিশেষভাবে মান্যতা দেওয়া হয়। সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন -

"অনেক দিন হইল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। এই অবহেলা একেবারে নিহেঁতু নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সাধারণ পাঠকের প্রবেশে বাধা আছে।"^{২৯} (খ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যেমন লোকজীবন অন্বেষণ করা যায়, তেমনি লোকশিল্পও। লোকশিল্পকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি -

১। শেত চামর সম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।^{৩০} জন্মখণ্ড: (৯ সংখ্যক পদ)

(অনুবাদ: তাহার চুল শ্বেত চামরের মত সাদা, দুইপাশে কপাল বসিয়া গিয়াছে।^{৩০})

বড়াইয়ের বয়স নির্ণয় করার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি শ্বেত চামরের উপমা ব্যবহার করেছেন। বড়াইয়ের চুল শুভ্র শ্বেত চামরের মত। নাসিকার মাঝখান বসা, গাল তোবড়ানো, গালের হাড় উঁচু, দাঁত বিসদৃশ, কথাবার্তা চতুরতাপূর্ণ।

২। কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।^{৩১}

(অনুবাদ: বিক্রয়ের কড়ি আনিয়া রাখা শাশুড়ীর হাতে তুলিয়া দেন।)^{৩১}

তাম্বুল খণ্ড: (৩২ সংখ্যক পদ) লোকশিল্প-কড়ি

৩। কাহাক দেখাহ তোক্ষ্ণে এত বীরপণে।

টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।^{৩২}

দানখণ্ড: (৪৬ সংখ্যক পদ)

(অনুবাদ: এত বীরপনা কাহাকে দেখাইতেছ? কংস খড়্গের এক আঘাতে তোমার প্রাণ লইবেন।)^{৩২}

৪। আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ। গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ।^{৩৩}

দানখণ্ড: (৮২ সংখ্যক পদ)

(অনুবাদ: ভৈরবপতনে গিয়া দেহ বিসর্জন করো, নহিলে গলায় কলসি বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করো।)^{৩৩}

৫। সোনার চুপড়ি বড়ায়ি রুপার ঘড়ী। নেত আঞ্চল সে দিআঁ ত ওহাড়ী।^{৩৪}

দানখণ্ড: (১০৭ সংখ্যক পদ)

(অনুবাদ: বড়াই গো, সোনার চুপড়িতে রুপার ঘট সাজাইয়া

তাহাতে নেতবস্ত্রের আবরণ দিয়াছি।)^{৩৪}

৬। ঘরের বাহির হৈতে তেলিনি তেল বিচিত্তেঁ কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।^{৩৫}

দানখণ্ড : (১২৪ সংখ্যক পদ)

(অনুবাদ: ঘরের বাহির হইতে দেখিলাম তেলিনী তেল বেচিতে চলিয়াছে, শুষ্ক ডালে বসিয়া কালো কাক ডাকিতেছে, শূন্য কলস লইয়া নারীরা যাইতেছে। এসব উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলাম, হাঁচি টিকটিকিও মানিলাম না। তাহার উচিত ফল পাইলাম।)^{৩৫}

রাধা প্রতিদিন মথুরার হাটে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করেন, বিক্রয়ের কড়ি শাশুড়ীর হাতে তুলে দেন। আধুনিক ‘বিনোদিনী’ নারী আর একালে হয়তো কখনো হাটে বাজারে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করে কড়ি উপার্জন করবেন না। হাট শেষে ফিরে এসে সে ‘কড়ি’ শাশুড়ীর হাতে তুলে দেবেন না হয়তো। সে রাধিকাও আজ আর নেই। সেই সে বৈষ্ণব কবি আর তার প্রেমচ্ছবি? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

“সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
 কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
 এত প্রেমকথা
 রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীর ব্যাকুলতা।
 চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হতে!”^{৪২}

আদিম সময়ের এক অমানবিক অধ্যায়ের কথা স্মরণ করায় খড়্গের ব্যবহারে। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজতন্ত্রের এক ছবি যেন আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। রাজতন্ত্রের সঙ্গে হত্যা এবং জন্মাদবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সেই নৃশংসতার প্রতীক খড়্গ। হিন্দুর লোকচিত্তে নিষ্ঠুর বলিপ্রথা সেই অমানবিক যুগের অবশেষমাত্র। রাজতন্ত্রের অবসানের সাথে সাথে তা আজ লুপ্ত উদ্ধার ছাড়া কিছু নয়।

৮২ - সংখ্যক পদ এবং ১২৪ - সংখ্যক পদদুটি ক্ষেত্রেই কলসির ব্যবহার আছে। কৃষ্ণের অন্যায় আলিঙ্গন স্পৃহা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাধা তাঁকে গলায় কলসি বেঁধে গঙ্গায় আত্মহত্যার উপদেশ দিয়েছেন। কলসির ব্যবহার ক্ষেত্রের ঘোরতর বিপর্যাস সহজেই অনুমেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি সাহিত্যে কলসির এমন ব্যবহারের নির্দশন মেলে। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আঠারো উনিশ শতকের সামাজিক বাস্তবতায় আত্মহত্যার সৃষ্ট পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পাপ মোচনের সহজতম পন্থা গ্রহণ করেছে নরনারী।

কলসিকে লোকসংস্কারের নিজস্ব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি। রাধা ঘরের বাইরে দেখেছেন তেলিনি তেল বেচতে চলেছে। গুঁড় ডালে বসে কালো কাক ডাকছে, শূন্য কলসি নিয়ে নারীরা চলে যাচ্ছেন। রাধা এইসব উপেক্ষা করলেন। এমন কি হাঁচি টিকটিকিও মানলেন না। রাধা সমস্ত লোকায়ত সংস্কারকে উপেক্ষা করলেন এবং তার যথোচিত ফল পেলেন। বাংলার প্রবাদে লোকশিল্পের এমন ব্যবহার লক্ষণীয়।

১০৭ সংখ্যক পদে লোকশিল্প হিসাবে চুপড়ির ব্যবহার লক্ষণীয়। রূপ যৌবনই রাধার শত্রু। যেমন হরিণী নিজের গায়ের মাংসের জন্য বিকল হয়। কৃষ্ণ রাধার শত্রু। কৃষ্ণকে উপেক্ষা করার জন্য রাধা সোনার চুপড়িতে রূপার ঘট সাজিয়ে তাতে নেতবস্ত্রের আবরণ দিয়েছেন। তাতেও কিছু কাজে লাগছে না। শেষে বড়াইকে জানাচ্ছেন, কৃষ্ণ যেন রাধিকার আশা ত্যাগ করেন। একান্তই ডোম জাতির নিজস্ব লোকশিল্প চুপড়ি। বাঁশ দ্বারা তৈরি হয় চুপড়ি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এমন চুপড়ি তৈরি করেন লোকায়ত শিল্পীরা। এখানে বাঁশের চুপড়িকে কবি কল্পনায় সোনার চুপড়িতে রূপান্তরিত করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীকার।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে লোকশিল্প হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে অলংকার এবং সেকালের বস্ত্রশিল্পই প্রধান।

৭। দানখণ্ড : পদ সংখ্যা : ৫৯

ক) শ্রবণে কুণ্ডল শোভা তোরে। এহার দান সাত লক্ষ মোরে।^{৪০}

(অনুবাদ: তোমার কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ইহার দান সাত লক্ষ।)^{৪৪}

লোকশিল্প - কুণ্ডল

খ) কর্ণদেশ তোর কন্মু সমানে। দশ লক্ষ হএ এহাত দাণে^{৪৫}

(অনুবাদ: তোমার কর্ণদেশ শঙ্খের মত সুন্দর। তাহার দান দশ লক্ষ হইবে।)^{৪৬}

লোকশিল্প-শঙ্খ

গ) চামর জিনিআঁ চিকুর তোরে। এহার দান দুই লাখ মোরে।^{৪৭}

(অনুবাদ: চামরের অপেক্ষাও সুন্দর যে তোমার কেশরাশি তাহার দান দুই লক্ষ মুদ্রা।)^{৪৮}

৮। দানখণ্ড : পদসংখ্যা-৬১

শ্রবণে শোভাএ তোর রতন কুণ্ডল। কুচযুগ শোভে যেহু শ্রীফল যুগল।

তখিত উপর শোভে হারমঞ্জরী। তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী।^{৪৯}

অলংকৃত রাধা। রাধার সৌন্দর্য অতুলনীয়। নানান অলংকারে সুশোভিত রাধা। আদি মধ্যযুগের প্রচলিত অলংকারে রাধা নিজেকে প্রসাধিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পুরাণের প্রভাব আছে। বড়ু চণ্ডীদাস রাধার সৌন্দর্য বর্ণনায় পুরাণকে গ্রহণ করেছেন। পুরাণে উল্লিখিত বিভিন্ন অলংকার বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যাচ্ছে। ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’ অনুযায়ী কৃষ্ণের পার্শ্বচর উদ্ধব কৃষ্ণের অনুমতিসাপেক্ষে রাধার কাছে এসেছেন। তিনি রাধাকে জানিয়েছেন, মালতী মালা, হিরার হার, মুক্তাহার পরিধান করে তিনি পালঙ্কে শয়ন করবেন। আর সখীরা শ্বেতচামর ব্যজন করে রাধিকার সেবায় নিরত থাকবেন। রাধা রত্নসিংহাসন এবং মনোহর হ্রদ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উদ্ধবকে দিলেন। রাধা উদ্ধবের কথামত নিজেও অমূল্য রত্ন অলংকার, হিরার হার, রত্নমালা পরিধান করে রত্নসিংহাসনে বসলেন। সখীরা শ্বেতচামরের বাতাসে রাধার পরিচর্যা করছেন। পুরাণকার লিখেছেন-

“বরং প্রসাদং দত্ত্বা চ সমুখায় মুদাষিতা।

বহিঃশুদ্রাংশুকে ধৃত্বা চামূল্যরত্নভূষণম্ ।।

হীরাহারং রত্নমালাং পরিধায় মনোহরাম্ ।

সিন্দুরং কজ্জলং পুষ্প-মাল্যং সুম্নিগ্ধচন্দনম্ ।।

রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস চ সন্মিতা।

সেবিতা পরিতো হৃষ্টা সখীভিঃ শ্বেতচামরৈঃ।।”^{৫০}

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাও সৌন্দর্য সচেতন। রাধার অলংকার কৃষ্ণকে মুগ্ধ করেছে। রাধার রূপ বর্ণনায় বড়ু পুরাণকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। বিশেষত পুরাণে উল্লিখিত লোকশিল্প বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে অনুসৃত হয়েছে।

৯। দানখণ্ড: পদসংখ্যা: ৬২

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার। হৃদয়ে কাধুলী গজমুকতার হার।

এহা আভরণ কাহ্নাঐঁ সব মোর নে। বেরি এক কাহ্নাঐঁ মোক ঘর জাইতেঁ দে।^{৫১}

(অনুবাদ: রাধার উক্তি-আমার প্রথম যৌবন রত্নদ্বার ভাণ্ডার। অতএব হে কৃষ্ণ, আমার বুকের কাঁচলি, গজমুক্তার হার - এই সকল আভরণ লইয়া আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দাও।)^{৫২}

১০। দানখণ্ড: পদসংখ্যা: ৬৫

পরিধান তোর। সুরঙ্গ পাটোল ধিরে যাসি বাটে।

আর আদভূত দেখেঁ চন্দ্রাবলী সিন্দুর সুর ললাটে।।

নিতি নিতি যাসি দধি দুধ বিকে পএর বাজে নূপুরে।

গিএ তোর মুকুতার হার তা দেখি কাহ্নাঐঁর লোভে।।^{৫৩}

(অনুবাদ: মণিকুণ্ডল, সুরঙ্গ, পটুবস্ত্র, ললাটের সিন্দুর, পায়ের নূপুর, বুকের কাঁচলি, মুক্তাহার ইত্যাদি কৃষ্ণকে রাধার প্রতি অধিকতর প্রলুব্ধ করে।)^{৫৪}

১১। দানখণ্ড: পদসংখ্যা: ৪৬

আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট। আলকে তিলক তোর শোভাএ ললাটে।।^{৫৫}

(কৃষ্ণের উক্তি: রাধা তুমি পরম রূপবতী। তোমার পরিধানে পটুবস্ত্র)^{৫৬}

১২। দানখণ্ড : পদ সংখ্যা : ৬৬

নেত পাটোল না পিন্ধিবো না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দুর।

বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর।।^{৫৭}

(অনুবাদ: স্বামীর অতিশয় প্রেমভাগিনী রাধা নিষ্ঠুর কৃষ্ণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সূক্ষ্ম পটবস্ত্র, সীমন্তের সিন্দুর, বাহুর বলয়, চরণের নূপুর সব বিসর্জন করিবেন স্থির করিয়াছেন।)^{৫৮}

১৩। দানখণ্ড: পদসংখ্যা: ১৩০

মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগতী।^{৫৯}
 (অনুবাদ: গজমুক্তা মর্কটের কণ্ঠে মানায় না)^{৬০}

১৪। রাধাবিরহ : পদসংখ্যা ৪০০

গিএ গজমুতি হার মণি মাঝে শোভে তার উচ কুচয়ুগল উপরে।
 হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুই ধারে পড়ে যেন সুমেরুশিখরে।।
 পহাইল হরিশমণে কণ্ঠত ভূষণগণে দেখি অভিসার সুশোভনে।
 মিলিহেমকরণে বাকিল অতি যতনে যেন কস্মু রতনক রতনে।
 মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভূজয়ুগলে পহায়িল আতি কুতূহলে।
 বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী রতন কঙ্কণ করমূলে।।
 রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিনী তাক গাঙ্কি বাকিল মাঝে।
 কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে।।
 কপূর কস্তুরী যোগে আঅর তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।^{৬১}

অনুবাদ: “রাধার গলায় রত্নমণিখচিত গজমোতির হার, উন্নত পয়োধর যুগলের উপর ওই মুক্তামালা যেন সুমেরু শিখরের দুই পার্শ্বে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতের মত শোভা পাইতেছে। বড়ই অভিসারিকার কণ্ঠে নানা অলংকার পরাইল, যেন স্বর্ণকারগণ শঙ্খরত্নকে অনান্য রত্ন দিয়া সজ্জিত করিল। হৃষ্টচিত্তে রাধার হাতে মণিকিরণে সমুজ্জ্বল অঙ্গদ, বাহুতে মুক্তা ও রত্নে জড়িত সোনার চুড়ি, করমূলে রত্নকঙ্কণ পরানো হইল। রতিরণে জয়বাদ্য বাজায় যে কিঙ্কিনী, রাধা তাহাই গাঁথিয়া কটিদেশে পরিলেন।... সোনার মল্লতোড় ও পাসলি দিয়া জঙ্ঘা চরণ এবং পদাঙ্গুলি ভূষিত করিলেন।”^{৬২}

৫৯-সংখ্যক পদে কৃষ্ণ রাধিকার দানের হিসেব করেন। চামরের অপেক্ষাও সুন্দর রাধিকার কেশরাশি, তার দান দু'লক্ষ মুদ্রা। রাধিকার কর্ণের কুণ্ডলের দান সাত লক্ষ মুদ্রা। আর রাধিকার কণ্ঠদেশ, যা শঙ্খের মত সুন্দর তার দান দশ লক্ষ। দান শোধ না করে রাধিকা যেতে পারবেন না। রাধিকার দেহগত সৌন্দর্যকে পার্থিব বস্তুগত লোকায়ত শিল্পসৌন্দর্যে চিরন্তন করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি। লোকায়ত শিল্প প্রয়োজন এবং প্রয়োজন উত্তীর্ণ সৌন্দর্যের দীপাধার। বড় চণ্ডীদাস রাধিকার দেহ সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্প সৌন্দর্যের এমন প্রাসঙ্গিক তুলনা করেছেন। ৬২, ৬৫, ১৩০ এবং ৪০০ সংখ্যক পদে গজমোতি বা গজমুক্তার হারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন বড় চণ্ডীদাস। ৬২-সংখ্যক পদে রাধিকা নিজের প্রথম যৌবনকে রুদ্ধদ্বার ভাঙার বলেছেন। বুকুর কাঁচলি, গজমুক্তার হার নিয়ে গৃহে ফিরে যেতে চেয়েছেন। ৬৫-সংখ্যক পদে রাধার প্রতি মুগ্ধ কৃষ্ণ। মুক্তাহার কিংবা পায়ের নূপুর রাধার প্রতি কৃষ্ণকে অধিকতর প্রলুব্ধ করেছে। ৪০০ সংখ্যক পদেও রাধার গলায় রত্নমণি খচিত গজমোতির হার। এই মুক্তামালা যেন সুমেরু শিখরের দুই পাশে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতের মত শোভা পাচ্ছে। রাধিকা রতিভাবে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে কৃষ্ণের চিত্তও চঞ্চল হয়ে উঠল। গজমুক্তাহার নায়িকার শোভাবর্ধন করেছে। অবশ্য ১৩০ - সংখ্যক পদে গজমুক্তাহারকে একটি প্রবাদ রূপে ব্যবহার করেছেন বড় চণ্ডীদাস। ফলে শ্লোকটি কাব্যমূল্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। বড়ইকে রাধিকা প্রলুব্ধ করেছেন, তোমার কি মনে হয় যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ আমার যোগ্য? এ প্রসঙ্গে প্রচলিত প্রবাদটি এরকম - ‘গজমুক্তা মর্কটের গলায় মানায় না।’ ৪৬, ৬৫, ৬৬ সংখ্যক পদে সেকালের বহুল উল্লিখিত লোকশিল্প পটবস্ত্রের নির্দশন সর্বত্রই মেলে। সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে সুন্দরী রাধিকার পরিধান হিসেবে পটবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন বড় চণ্ডীদাস। কৃষ্ণ পটবস্ত্র পরিহিতা রাধিকাকে পরম রূপবতী বলে উল্লেখ করেছেন (৪৬ সংখ্যক পদ)। ৬৫-সংখ্যক পদে রাধিকার পটবস্ত্র কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করেছে। তিনি চুম্বন এবং আলিঙ্গন প্রার্থনা করেন। ৬৬-সংখ্যক পদেও সূক্ষ্ম পটবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন বড় চণ্ডীদাস। আদি মধ্যযুগতো বটেই, সমগ্র অন্ত্য মধ্যযুগব্যাপী এমন পাটবস্ত্রের কদর ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন কবিরা রূপবতী নায়িকাদের সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পাটবস্ত্র ব্যবহার করেছেন।

এছাড়া পায়ের নূপুর, মণিকুণ্ডল, বাহুর বলয়, সোনার চুড়ি, শঙ্খরত্ন রাধিকাকে রূপবতী করে তুলেছে। সেই সঙ্গে রাধিকার নান্দনিক মুগ্ধতা কৃষ্ণের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়েছে। সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে লোকশিল্পের ব্যবহার নানাভাবে উল্লেখ করেছেন কবি। যা আজ হারিয়ে যাওয়া লুপ্ত স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কাব্যটিকে সুযমা মণ্ডিত করেছে নিশ্চয়ই।

সাত

কৃষ্ণ প্রেমিক। শুধু প্রেমিক নয়, তিনি শিল্পী। তিনি লোকশিল্পের স্রষ্টা। নৌকা সৃষ্টি করেছেন তিনি। বাঁশি সৃষ্টি করেছেন তিনি। নাবিক কৃষ্ণ এবং বংশীধর কৃষ্ণ লোকশিল্পের ইতিহাসে নতুন গবেষণার বিষয়। অবহেলায়, উন্নাসিকতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করতে করতে আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেকালের বেঁচে থাকার মৌল একক লোকশিল্পকে। যখন গ্রন্থটি আমাদের অধিগত এবং সুসম্পাদিত, তখন লোকশিল্পগুলি পরিবর্তনমুখী, অনেক কিছুই হারানো শিল্প, নতুন কালের প্রলেপ লেগেছে তাতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের এসব শিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। একালের সায়েন্স এবং টেকনোলজির আলো বলমলে রশ্মিতে মুখ লুকিয়েছে। হয় বড় চণ্ডীদাস, তোমার সেই পুরানো কালের বাংলা, পুরানো কালের জনপদ, জাতি-বৃত্তি-সম্প্রদায় কেমন ছিল? পুরানো কালের লোকশিল্পের অনুসন্ধান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আজও মাইলস্টোন স্বরূপ। আর সেই সে রাধিকা, তার জীবন অসার হয়ে গেছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি শাস্ত্র প্রেমিকা। পার্থিব শিল্প সৌন্দর্য তাঁর কাছে মূল্যহীন। ঘুম নেই তার। কবি লিখেছেন -

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিন্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ।।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ [মো] যে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।^{৬০}

শাস্ত্র প্রেমিকা রাধা। তাঁর জীবনে শিল্প সৌন্দর্যের কোন মূল্য নেই। রাধাবিরহ পর্যায়ের আর একটি পদে রাধা অনুরূপ অঙ্গসজ্জাকে তুচ্ছ করেছেন -

'মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।^{৬৪}

এ এক মর্মভেদী দহন। এখানে কোন কামনা নেই, কোন ভোগকাজ্জা নেই, লোকশিল্প এখানে উপেক্ষিত। এই রাধা বিষণ্ণতার সুর শুনিয়েছেন পাঠককে। নিত্যকালের বিরহের সুর সর্বদেশের আকাশে বাতাসে অনুরণিত হয়। উঠে চেউ, পড়ে চেউ। হৃদয় দুলে ওঠে। কিন্তু তিনি (কৃষ্ণ) আসেন না। দিনের পর দিন যায়। রাতের পর রাত। প্রতীক্ষা করেন রাধা। তবুও তিনি (কৃষ্ণ) আসেন না। লোকশিল্প তুচ্ছ হয়ে যায়। মহতী জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসে। জীবন শেষ হয়। ব্যক্তিকে ছাপিয়ে যায় বেদনার রাগিনী। জন্ম নেয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

"যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন-
বক্ষে পড়ে রক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ--
সেদিনও এমনিরো অন্ধকার দিন।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা

সারাদিন, সারাবেলা--

এখনো কাঁদছে রাধা হৃদয় কুটিরে।”^{৬৫}

আদিমধ্য যুগের অনবদ্য গ্রন্থ বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্রাত্য নিম্নবর্গীয় মানুষের উল্লেখ যেমন আছে, ঠিক তেমনি তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের নমুনা কম নয়। বিশেষত ডোম সম্প্রদায়ের সৃষ্ট শিল্প ঝুড়ি এবং কুমোরের তৈরি কলসির উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। ঝুড়ি বাঁশ এবং বেত দিয়ে তৈরি শিল্প। আর মাটির কলসি কুমোরের তৈরি। এসব শিল্প কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বেঁচে আছে। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে পাড়া-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় গেছে হারিয়ে। গ্রাম জীবনে ভেঙে গেছে সেই যুথবদ্ধ মানুষের জীবনাচরণ। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব বেশি বেঁচে নেই।

লোকায়ত মানুষ বৃত্তি পরিবর্তন করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে লোকশিল্পগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে, সেগুলি মধ্যযুগের শিল্প হিসেবে সাহিত্যে চিরন্তন হয়ে আছে। একথা ঠিক, মধ্যযুগের লোকশিল্প ছিল অকৃত্রিম। তা লোকশিল্পের আদিরূপ বজায় রেখেছিল। যদিও সংস্কৃতি চলমান এবং লোকশিল্প বহমান সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেইহেতু লোকশিল্পে প্রথাগত চিহ্ন থাকলেও তাতে চলমানতার ধর্ম ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজদের আগমন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন উদ্ভাবনে বিশেষত কাচ, প্লাস্টিক, ফাইবার প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের পর্যাণ্ড ব্যবহারে লোকশিল্প গভীর স্পষ্ট রৈখিক বাঁক নিয়েছে। ফলত বিশুদ্ধ লোকশিল্প লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। সেই লোকশিল্পকে সহজে আর পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না। লোকশিল্প গবেষক ড. প্রদ্যোত ঘোষের চিন্তাশীল মন্তব্যটি এক্ষেত্রে গভীরভাবে রাখাপাত করে-

“তবে এই লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির অন্য সব রূপের ন্যায় চলিষ্ণু ও গতিমান। এবং তা গ্রহণ বর্জন, পরিবর্তন - পরিবর্তনে তার অগ্রগতির প্রবাহ অব্যাহত থাকলেও তা আর যথার্থ লোকশিল্প না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে লোকশিল্পানুগ হয়ে পড়ে। পরিবর্তনে ... কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট যুগের প্রভাবে যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তাতে আর পুনরুজ্জীবনের কথা উচ্চারণ করা অতি বড় আশাবাদীর পক্ষেও দুরাশা মাত্র। কারণ সমাজের যেসব বৃত্তি ও সম্প্রদায়ে সম্মত হয়ে যুগ পরম্পরায় একই আবহে এই লোকশিল্প লালিত, তা আজ আর দেখা যায় না। অতীতের সেই লোকায়ত জীবনের সমাজ কাঠামোর ভাঙন রোধ সম্ভব নয়। আবার তা অতিরিক্ত ভিন্নরূপরীতি সমৃদ্ধ হয়ে লোকশিল্পের চণ্ড বা মাধ্যম গ্রহণ করে ব্যাজ বা ব্যতিরেকী লোকশিল্পের চণ্ড বা মাধ্যম গ্রহণ করে ব্যাজ বা ব্যতিরেকী লোকশিল্প (Fake Folk Art) অথবা বিকৃত লোকশিল্প (Corrupt Folk art) হয়ে দাঁড়ায়।”^{৬৬} লোকশিল্প চেতন অবচেতন ভাবেই ব্যক্তি এবং সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে।

লোকশিল্পের শেকড় দৃঢ়ভাবে প্রকৃতির মর্মমূলে প্রোথিত। বাংলার লোকশিল্প এক অর্থে ভারতীয় শিল্পের মুখচ্ছদ। লোকশিল্প জাতীয় শিল্পধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোকমনের মধ্যে জাতীয় শিল্পের রশ্মিরাগ এবং হৃদয় স্পন্দন বিদ্বিত হয়। বাংলার লোকায়ত শিল্পীরা বহন করেছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার। মুচি, কুমোর, কামার, তেলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ শিল্পী। তারা ব্রাত্য শিল্পী। তারা আমাদের জাতীয় শিল্পকে পুষ্ট করেছে। Stella Kramrisch তাঁর ‘The Art of India’ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন -

“Just as Indian art is firmly rooted in nature, that is to say in the experience of its unconscious Processes, which are made conscious inasmuch as they become form, so it is securely established in its social context and its Supra-Personal Origin.

The craftsman, his patron, and the public for whom he makes the work of art are magically one, and this relationship is further supported by the fact that the craftsman is a link in the unbroken chain of the tradition.”^{৬৭}

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে উল্লিখিত রাধাকৃষ্ণের অলংকার ভারতীয় মিথের অনুষ্ণেই কবি ব্যবহার করেছেন। কাব্যে পটুবস্ত্রের উল্লেখ যেমন আছে, ঠিক তেমনি ভারতীয় পুরাণ এবং ঐতিহ্য অনুসারী লোকশিল্প নূপুর, বাহুর বলয়, মণিকুণ্ডল, সোনার চুড়ি, শঙ্খরত্ন প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন বড় চণ্ডীদাস। রাধার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বিষাদ-নৈরাশ্যের মধ্যে রক্তমাংসের

লোকায়ত নারীর ক্রন্দন ফুটে উঠলেও নায়িকার অলংকরণের ক্ষেত্রে কবি ভোলেননি ভারতীয় পুরাণের মহিমাকে। রাধার ব্যবহৃত শিল্প ভারতীয় মিথের আধারেই গড়ে উঠেছে। Stella Kramrisch তাঁর 'The Art of India' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন-

"In this art, the shape of man and all Subsidiary figures are ordered in accordance with a living myth."^{৬৮}

লোকশিল্পীরা নাম গোত্রহীন মানুষ। তাঁরা হারিয়ে গেছেন। শুধু ক্ষীণভাবে রেখে গেছে তাঁদের বহমান উত্তরাধিকার। বড় চণ্ডীদাসের কালের সেই বিশুদ্ধ শিল্পও নেই, সে শিল্পী তথা শিল্পীসমাজও নেই। কিন্তু উচ্চতর শিল্প এবং শিল্পীর উপর লোকশিল্পের প্রভাব অনেক। একালের অনেক শিল্পীই লোকশিল্পের মোটিফ, প্রতীক এবং সিম্বলকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেগুলি যথার্থ লোকশিল্প হয়ে ওঠেনি। Pran Nath Mago তাঁর 'Contemporary Art in India - A Perspective' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন -

"We can better understand Contemporary Indian art activity if we understand the influence of folk-arts. A number of Indian artists have turned to the rich and widespread traditions of folk-arts for inspiration."^{৬৯}

সে কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উল্লিখিত কৃষ্ণের নৌকা এবং বাঁশি একালে কিছু ক্ষেত্রে টিকে থাকলেও আধুনিক শিল্পসভ্যতায় যন্ত্রযুগের প্রচ্ছায়া সেই শিল্পের উপর বর্তেছে। ফলত হারিয়ে গেছে সেই সেকালের লোকশিল্পীর সৃষ্ট শিল্প - মোটিফ। মধ্যযুগে লোকশিল্পের বিশুদ্ধ রূপ আর বর্তমানে বেঁচে নেই। মধ্যযুগের ঐ শিল্প বর্তমানে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। একালের উচ্চতর শিল্পীবৃন্দ লোকশিল্পী এবং তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের অনুসরণ করেছেন। এই সব অনুকারী শিল্পীদের হাতে অনেকক্ষেত্রেই লোকশিল্পের বিকৃতি ঘটেছে। লোকশিল্প সমাজ মানসের সৃষ্টি। শত শত বছর ধরে নির্দিষ্ট নাম চিহ্নহীন জাতি-গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সৃষ্টি করেন এই শিল্প। লোকশিল্পী এই শিল্পের স্রষ্টা। লোকসমাজ লোকশিল্পের সঞ্চালক, রক্ষক এবং বাহক। বড় চণ্ডীদাস লোকশিল্পকে তাঁর কাব্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করে লোকজীবনের প্রাণ চঞ্চলতাকে সুচিরজীবী করে রাখলেন তাঁর কাব্যে। বাঙালির শিল্পসাধনা ভাষা পেল। কবি বাঙালির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অমর হয়ে রইলেন।

Reference:

১. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত বংশীখণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১১৬
২. ত্রিবেদী, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর, 'মুখবন্ধ'-অংশ, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সম্পাদিত, চণ্ডীদাস বিরচিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৩. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, নৌকাখণ্ড। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৮৩
৫. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, নৌকাখণ্ড। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৫৮
৬. তদেব
৭. পূর্বোক্ত, নৌকাখণ্ড, পৃ. ৫৯
৮. পূর্বোক্ত, নৌকাখণ্ড, পৃ. ৬৩
৯. খান, ড. লায়েক আলি, প্রসঙ্গ : বৈষ্ণব সাহিত্য, কবিতিকা, ১৪১৯, ভূর্জপত্র, মেদিনীপুর, পৃ. ৬৪
১০. বসু, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, জানুয়ারী-১৯৬৫, কলকাতা, পৃ. ৪১
১১. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, নৌকাখণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৬৫

১২. খান, ড. লায়েক আলি, প্রসঙ্গ: বৈষ্ণব সাহিত্য, কবিতিকা, ১৪১৯, ভূর্জপত্র, মেদিনীপুর, পৃ. ৪৮
১৩. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, ছত্রখণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৭৬
১৪. পূর্বোক্ত, ছত্রখণ্ড, পৃ. ৭৭
১৫. তদেব
১৬. পূর্বোক্ত, ছত্রখণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮
১৭. পূর্বোক্ত, ছত্রখণ্ড পৃ. ৭৬-৭৭
১৮. পূর্বোক্ত, হারখণ্ড, পৃ. ১০৩
১৯. পূর্বোক্ত, হারখণ্ড, পৃ. ১০৫
২০. বসু, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, জানুয়ারী-১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৫২
২১. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, বংশীখণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১১৫-১১৬
২২. পূর্বোক্ত, বংশীখণ্ড, পৃ. ১২৩
২৩. তদেব
২৪. পূর্বোক্ত, বংশীখণ্ড, পৃ. ১১৭
২৫. পূর্বোক্ত, বংশীখণ্ড, পৃ. ১২০
২৬. পূর্বোক্ত, বংশীখণ্ড, পৃ. ১১৬
২৭. ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, 'মুখবন্ধ'-অংশ, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
২৮. খান, ড. লায়েক আলি, প্রসঙ্গ: বৈষ্ণব পদাবলী, কবিতিকা, ১৪১৯, ভূর্জপত্র, মেদিনীপুর, পৃ. ৭৩-৭৫
- ২৯.ক. Chatterjee Suniti Kumar, The Origin and Development of the Bengali Language. Third Impression -2002, Published by-Rupa-Co. 7/16, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002, PP. 128-129
- ২৯.খ. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, সপ্তম আনন্দ সংস্করণ, জুন-২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৪৮
৩০. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, জন্মখণ্ড, ৯ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৩
৩১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২০৪
৩২. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত তাম্বুলখণ্ড, ৩২ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১২
৩৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২১৮
৩৪. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, ৪৬ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১৭
৩৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২২৬

৩৬. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, ৮২ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৩০
৩৭. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৪৭
৩৮. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, ১০৭ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র-১৪২২, পৃ. ৪০
৩৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৬১
৪০. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, ১২৪ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৪৬
৪১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৬৯
৪২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব কবিতা ('সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয়খণ্ড, পৌষ-১৪০২, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৃ. ৩৩-৩৪
৪৩. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, ৫৯ সংখ্যক পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২২
৪৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৩৪
৪৫. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৫৯, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২২
৪৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৩৪
৪৭. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৫৯, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র-১৪২২, পৃ. ২২
৪৮. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৩৪
৪৯. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৬১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২৩
৫০. তর্করত্ন, শ্রীযুক্তপঞ্চগনন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫৪১
৫১. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৬২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২৩
৫২. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৩৬
৫৩. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৬৫, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ২৪
৫৪. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৩৮
৫৫. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৪৬, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,

কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১৭

৫৬. ভট্টাচার্য্য অমিত্রসূদন, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২২৬

৫৭. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ৬৬, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র-১৪২২, পৃ. ২৪-২৫

৫৮. ভট্টাচার্য্য অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৩৮

৫৯. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, দানখণ্ড, পদসংখ্যা - ১৩০, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৪৮

৬০. ভট্টাচার্য্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৭৩

৬১. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, রাধাবিরহ, পদসংখ্যা - ৪০০, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১৫০-১৫১

৬২. ভট্টাচার্য্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (অনূদিত অংশ), দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৪৪০

৬৩. রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত, রাধাবিরহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১৩২

৬৪. পূর্বোক্ত, রাধাবিরহ, পৃ. ১৫৫

৬৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, একাল ও সেকাল (কবিতা), কাব্যগ্রন্থ-মানসী, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৌষ ১৪০২, পৃ. ২৪৬-২৪৭

৬৬. ঘোষ, ড. প্রদ্যোত, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণী, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ১৬২

৬৭. Kramrisch, Stella, The Art of India, The phaidon press, 5 Cromwell place, London s.w-7, Third Edition 1965, P. 13

৬৮. ibid, P. 10

৬৯. Mago, Pran Nath, Contemporary Art In India, A Perspective, National Book Trust, India, First Edition-2001, P. 97